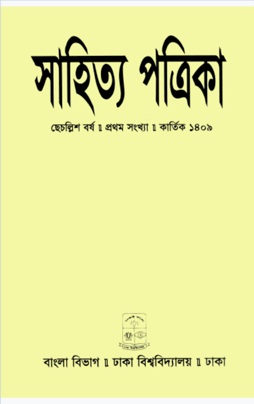

Vol. 46 | No. 1 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

'ক্রীতদাসের হাসি'-র প্রতীকধর্ম ও শিল্প-কুশলতা

Volume	46
Issue	1
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Soumitra Sekhar
Published online	October 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v46i1.346
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i1.346
Pages	143-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

'ক্রীতদাসের হাসি'-র প্রতীকধর্ম ও শিল্প-কুশলতা

Check for updates

সৌমিত্র শেখর *

শওকত ওসমানের 'রূপক উপন্যাস' হিসেবে পরিচিত 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) গ্রন্থাকারে প্রকাশ-বর্ষেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অধিক অর্থমূল্য ও সম্মানের 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কারে' ভূষিত হয়। লেখকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফৌজি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। অথচ উপন্যাসটিতে ভিন্ন আবহে আইয়ুব খানের দুঃশাসনে প্রপীড়িত পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের আত্মিক প্রতিবাদ বিঘোষিত। এক সাক্ষাৎকার ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন :

> আমার ঐ সময়কার উপন্যাসে রূপক অর্থে উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করার অনেকগুলো কারণ ছিলো। যেমন ধর ১৯৬১ সালে রচিত 'ক্রীতদাসের হাসি'র কথাই। এ সময়ে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এতো কড়াকড়ি ছিলো যে, সরাসরি কাউকে কিছু বলা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্রও শব্দ করা যেত না। ঐ কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করেও আমি 'ক্রীতদাসের হাসি' লিখেছি। ঐ সময় স্বৈরাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিলো। একজন শিল্পী তো আর বসে থাকতে পারে না। তাই ঐ স্বৈরাচারী সরকারের শঠের সঙ্গে আমিও শঠ করলাম। যেহেতু তার ব্যাকগ্রাউণ্ডটা মধ্যপ্রাচ্য, আরব দেশ, অষ্টম শতাব্দী সুতরাং ওরা ভাবলো আমি একটা আরব্য উপন্যাস লিখে ফেলেছি, রূপকথা লিখে ফেলেছি। কিন্তু যখন বুঝতে পারলো তখন It was too late, তাছাড়া ওরা আমাকে সরাসরি কথা বলতে দেবে না। তাই বাধ্য হয়ে ঐসব উপন্যাসে রূপকের আশ্রয় নিয়েছিলাম।"[১]

মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে লেখক কথিত পূর্বোল্লিখিত 'রূপক অর্থে' বা 'রূপকের আশ্রয়' বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। কেননা লেখকের এ ধরনের বক্তব্যকে পুঁজি করেই সম্ভবত আলোচকদের দ্বারা 'ক্রীতদাসের হাসি' 'রূপকধর্মী' উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে আসছে।

ইংরেজি 'Allegory' শব্দের অর্থ 'রূপক'। একটি রূপের আধারে কোন বিশেষ ভাব ধারণা বা বক্তব্য প্রকাশ এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও রূপক শুধুমাত্র ওই

* সৌমিত্র শেখর, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

'বিশেষে'ই সীমাবদ্ধ থাকে না। যেমন 'চর্যাপদে' ব্যবহৃত রূপক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও অধ্যাত্ম যে-কোন দিক থেকেই সত্য। সেজন্যেই বলা যায়, একাধিক বক্তব্যের প্রতিফলক হয়ে উঠতে পারে এই শিল্পকলা। আসলে 'সহজ করে বাহ্য ও লৌকিক জীবনের রূপ বর্ণনার সাহায্যে লেখকের ভাব বা তত্ত্ব যখন অভিব্যক্ত হয় না, তখনই লেখক রূপকের আশ্রয় নেন।'[২] গ্রিক ক্রিয়াপদ 'Synballen' থেকে 'Symbol' বা প্রতীক শব্দটি জাত। 'Stoic' দার্শনিকেরা প্রতীকের বহুমুখিতা নিয়ে নানা ব্যাখ্যা-দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন এবং এর থেকেই পরে 'Hermenentics' নামে একটি বিশেষ ব্যাখ্যানবিদ্যারও উদ্ভব হয়। মূলত প্রতীক একটি বিশেষ ভাব বা বক্তব্যকে অবলম্বন করে সৃজিত ও বিকশিত। বক্তব্য-আধেয় এক হলেও আধার-সুষমাই ক্ষণিকের জন্যে এতে প্রধান হয়ে ওঠে। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের জন্যে রূপক ও প্রতীকের অর্থ অনেকের কাছে এক বলে প্রতিভাত হতে পারে। 'গ্যেটে, কীটস ও বোদলের-এর রচনাতেও– 'সিম্বল' ও 'অ্যালেগরি'র (রূপক) পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। প্রায়শ 'সিম্বল' একাকার হয়ে গেছে 'ফিগার' (বাঙ্‌মূর্তি) ও 'ফিগারেটিভ'-এর সঙ্গে।'[৩] এ কারণে শওকত ওসমান যদিও 'ক্রীতদাসের হাসি'তে 'রূপকের আশ্রয়' নিয়েছিলেন বলেন, তারপরও আমরা উপন্যাসটিকে 'প্রতীকধর্মী' বলতে চাই। কেননা উপন্যাসটিতে তৎকালীন পাকিস্তানের একনায়ক সামরিক শাসক আইয়ুব খানের স্বেচ্ছাচারিতা এবং বাঙালির প্রতিবাদ ও আত্মিক স্বাধীনতার বাণী শুধুমাত্র বক্তব্য উপস্থাপনার মাধ্যমেই নয়, প্রতিনিধিত্বশীল সম্পূরক চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই প্রতীকাশ্রয়ে ওই সময়ের এক একটি চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছে। এদের প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব। আইয়ুবী শাসনামলের যেভাবে ও যতটুকু সুচারু উপস্থাপনা আছে উপন্যাসটিতে অন্য কোন স্থান-কালের সঙ্গে এর পার্থক্য যোজন-দূর। এই নিকট-দৃশ্যই উপন্যাসটিকে 'প্রতীকধর্মী' হিসেবে আরও বেশি প্রমাণ করে।

২.

বাগদাদের স্বেচ্ছাচারী বাদশা হারুনার রশীদ এক গভীর রাতে হাবসী গোলাম তাতারী ও আরমেনী বাঁদি মেহেরজানের দাম্পত্যসুখ লাভে উৎসারিত উচ্ছল প্রাণদ হাসি শুনতে পায়। পরে গোলামকে মুক্ত করে ধন দৌলত ও বাগান দিয়ে স্বাধীন করে দেয়া হয়। বিনিময়ে বাদশাকে হাসি শোনাতে হবে– শর্ত এই। সুন্দরী বাঁদি মেহেরজানকে বেগম করে বাদশা অন্দরমহলে স্থান দেন। কিন্তু এরপর তাতারী আর হাসে না। সেনাপতির তলোয়ারের ভয় কিংবা বাদশা কর্তৃক প্রেরিত সুন্দরী বুসায়নার প্রলোভন কোন কিছুই তাতারীর হাসির ঝর্নাধারার বাধ খুলে দিতে পারে

না। নির্যাতনের ফলে মৃত্যুকালে তার শেষ উচ্চারণ : দিরহাম-দৌলত দিয়ে গোলাম-বাঁদি কেনা গেলেও হাসি কেনা যায় না। 'ক্রীতদাসের হাসি'তে বর্ণিত মূল কাহিনী এটুকুই। অবশ্য এর আগে শিরোনামহীন একটি ছোট প্রস্তাবনা আছে।

গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার কয়েকমাস পরে ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্যে সাময়িকী সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকালে' এর বিকৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো।[৪] সমালোচক উপন্যাসটিতে 'রূপকথা' অনুসন্ধান করে একে 'চিত্র-নাট্য' প্রভাবিত বলে মন্তব্য করেছেন। পুরস্কার প্রাপ্তির পর উপন্যাসটির বিরূপ সমালোচনা যেন আরও তীর্যক হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে দুটো মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক :

> **এক.** ['ক্রীতদাসের হাসি'কে আদমজী পুরস্কার দিয়ে] এদেশের সর্বসাধারণের সাহিত্য রুচির প্রতিই শুধু তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয় নি, সাহিত্য পুরস্কারের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করি। পীরের আলখেল্লার ভিতর এ ভূত ভাগাবে কে?[৫]
>
> **দুই.** [শওকত ওসমান] যদি ছোট গল্পের জন্য পুরস্কার পেতেন তাতেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন হতো। অথচ তিনি পুরস্কার পেলেন ক্রীতদাসের হাসি নামক একটি সস্তা জনপ্রিয় উপন্যাসের জন্য।[৬]

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকাশের পাঁচ-ছয় বছর পরও উপন্যাসটির প্রতীকাশ্রয়ের স্বরূপ সব ধরনের পাঠক-সমালোচকের কাছে যেমন উদ্‌ঘাটিত হয় নি, তেমনি যথাযথ সাহিত্যিক মূল্য থেকেও উপন্যাসটিকে করা হয়েছে বঞ্চিত।

শওকত ওসমান অন্বিষ্ট মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে প্রতীকী আড়ালের দ্বারোদ্‌ঘাটন আবশ্যক। বাদশা হারুনার রশীদ ও তার পারিষদবর্গকে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর প্রতীক ধরা চলে, আর তাতারী-মেহেরজান বাঙালি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে কল্পনা করা যায়। এ থেকে আরও সূক্ষ্ম বিভাগ হতে পারে এভাবে– বাদশা হারুন : একনায়ক সামরিক শাসক আইয়ুব খান, বন্ধু সেনাপতি মশরুর : আইয়ুব খানের বাধ্য সৈন্যবাহিনী, বেগম জুবাইদা : পাকিস্তানের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, আলেম আবদুল কুদ্দুস, জল্লাদ ও পারিষদবর্গ : ইসলামের ধ্বজাধারী শাসকের স্বার্থরক্ষাকারী ধর্মব্যবসায়ী ও তাদের অনুচর-সমর্থক, তাতারী : পূর্ব-পাকিস্তানের মেহনতি-শ্রমজীবী মানুষ, মেহেরজান : বাংলার স্বাধীনতা– যা তুর্কি, মোগল, ব্রিটিশ, পাকিস্তানীদের কাছে বার বার হাত বদল হয়েছে, কবি নওয়াস ইসহাক : বাংলার কবি, শিল্পী, সংস্কৃতিবান মানুষের প্রতিনিধি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'Basic Democracy'-র নাম করে আইয়ুব খান পূর্ব-পাকিস্তানে

সামরিক শাসন জারি করার পর যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে এর ফলে শওকত ওসমানকে রূপ-প্রতীকের আশ্রয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী যেহেতু ওই সময়ের ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিনিধি এবং পরিবেশ প্রতীকাশ্রয়ে ১৯৬২-উত্তর পূর্ব-পাকিস্তানকেই ব্যঞ্জিত করে, সেদিক থেকে বিচার করলেও উপন্যাসটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের তথ্যচিত্রে পরিণত হয় নি। বরং কালের অনিবার্যতাকে ধারণ করে কালোত্তীর্ণ শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে এটি। প্রতীকের আড়ালে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের আত্মিক স্বাধীনতার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি যে উপন্যাসটির পরতে পরতে অনুরণিত এ বিষয়টি আমাদের কাছে মোটেও গৌণ নয়। মানুষের আত্মার প্রতিধ্বনি হাসি অত্যাচারীর ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার শাশ্বত বাণী নিশ্চয়ই একটি মহান বার্তা বহন করে। কিন্তু এটিই উপন্যাসের সবটুকু নয়। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটির "দশম সংস্করণ" প্রকাশিত হওয়ায় নিশ্চিত বোঝা যায় এর জনপ্রিয়তা মোটেই কম ছিলো না। তাছাড়া এর ইংরেজি অনুবাদ ও নাট্যরূপও প্রকাশিত হয়েছে।– এ জনপ্রিয়তার সূত্র-সন্ধান আবশ্যক।

জুলাই, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্রীতদাসের হাসি'র সেপ্টেম্বর- অক্টোবর ' ৬২-এ প্রকাশিত 'সমকালে'র 'পুস্তক সমালোচনার' আগে আর কোথাও কোন আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো বলে জানা যায় নি। তাই একেই আমরা গ্রন্থটির প্রথম সমালোচনা হিসেবে ধরে নিতে চাই। এতে উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> রূপকথার রূপ যদিও বা তিনি দিতে পেরেছেন– কথার রস সঞ্চার করতে পারেন নি; কাঠামোটাই শুধু তৈরী হয়েছে– প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। এর জন্য লেখকের অক্ষমতা যতোখানি দায়ী তার চাইতে অধিকাংশে বেশী দায়ী হলো এর গল্প বলার রীতি– আংগিক। কারণ আংগিক গঠনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত নয়।[৭]

বলা বাহুল্য রূপকথার প্রধান বৈশিষ্ট্য: কোন নির্দিষ্ট স্থান ও কালের দ্বারা যেমন এগুলো সুচিহ্নিত নয়, তেমনি ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারাও এগুলো রচিত হয় নি। 'তবে কোন উপন্যাসে রূপকথার উপাদান সচেতনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আবার রূপকথার কোন বিশেষ কাহিনীতে উপন্যাস-লক্ষণ আভাসিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য রূপকথার ফ্যান্টাসির জগৎ নয়– পক্ষীরাজের পক্ষবিস্তার, কড়ির পাহাড়– হাড়ের পাহাড়– সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কোন ঘুমন্ত রাজকন্যার শিয়রে রাজপুত্রের পৌঁছে যাওয়া নয়, তার লক্ষ্য বাস্তব মানবজীবন, নরনারীর হৃদ্‌স্পন্দন।'[৮] এ বিচারে 'ক্রীতদাসের হাসি'কে

উপন্যাসই বলতে হয়। তার পরও শওকত ওসমানের সমসাময়িক এক ঔপন্যাসিক বলেন, 'ক্রীতদাসের হাসি– উপন্যাসের চাইতে নাটকই বেশী।'[৯] আসলে সাহিত্যশিল্পের 'উপন্যাস' ধারার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গঠনশৈলী বা সংজ্ঞা নিয়ে সূক্ষ্ম মতভেদ থাকলেও মানুষ ও তার সামাজিক নির্ভরতাকে গ্রহণ ও অভিব্যক্তি দেবার প্রয়াশই যে উপন্যাস– এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। র‍্যালফ ফক্স তাঁর 'Novel and the people' (1937) গ্রন্থে মধ্যযুগের সমাজবাস্তবতা এবং উপন্যাসের কাঠামো ও বিষয় সম্পর্কিত ব্যাপক আলোচনা করেন। তাঁর মতের সঙ্গে 'ভারতকোষে' প্রদত্ত উপন্যাসের সংজ্ঞার বড় কোন পার্থক্য নেই : 'কার্যকরণ শৃঙ্খলিত, চরিত্রদ্যোতক ও জীবন স্বরূপ নির্দেশক কাহিনীই উপন্যাস'।[১০] আর এই 'শৃঙ্খলিত' অর্থাৎ সেতুবন্ধনের জন্যে (Method of Communication) প্রয়োজন একটি বিশিষ্ট ভাষারীতির। রিচার্ডসন, ডিফো, ফিল্ডিং প্রমুখের রচনাতে অগ্রজ নাট্যসাহিত্যের প্রভাব-অধিকার স্পষ্ট। এলিজাবেথীয় নাটকের সংলাপ-নিরীক্ষা, গদ্য-পদ্যের মিশ্ররীতি বা চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুসারে পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে সংলাপ বলানোর কৌশল ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস রচনার বিশেষ সহায়ক হয়েছিলো। ফলে উপন্যাসে সংলাপ ব্যবহার কোন দোষের নয়। নাটকে দৃশ্যগুণ ও কাব্যগুণ যেখানে সবচেয়ে বড়, উপন্যাসে জীবনবোধ ও তার ক্রিয়া-সংঘন বিস্তৃতিই কাম্য। মৃণাল লিখিত একটি চিঠি যদি রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' নামের ছোট গল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কতগুলো চিঠির পসরা নিয়ে যদি কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধনহারা' বা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রৌঞ্চ মিথুন' উপন্যাসের মর্যাদা পায়, এমন কি সংলাপসমৃদ্ধ বুদ্ধদেব বসুর 'অনেক রকম' উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত হলে শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'কেও 'উপন্যাস' বলে অভিহিত করতে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। তবে আলঙ্করিক ও শিল্পরসবেত্তাগণের সমর্থনে প্রকরণগত বৈচিত্র্য ও করণকুশলতার ভিন্নতার জন্যে একে আমরা উপন্যাসের একাধিক উপ-বিভাগের একটি, 'নাট্যোপন্যাস' ধারার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

৩.

'ক্রীতদাসের হাসি'র প্রারম্ভেই একটি শিরোনামহীন প্রস্তাবনা আছে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এটি ছিলো সাতাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী, সপ্তম সংস্করণ থেকে, সোয়া চার পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মূল কাহিনী ফাঁদার জন্যেই মূলত এ প্রস্তাবনা। উপন্যাসটি নাকি নাস্তালিখ অক্ষরে লিখিত 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে' অর্থাৎ 'সহস্র দুই রাত্রি' গ্রন্থের শেষ কাহিনীর অনুবাদ। এতোদিন 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা' বলে যে গ্রন্থটির নাম জানতাম তা আসলে সহস্র এক রাত্রি নয়। আরও একটি

অনাবিষ্কৃত কাহিনী ছিলো যা লেখকেরা তিনবন্ধু মিলে শাহ্ ফরিদ উদ্দীন জৌনপুরী নামক এক মৌলানার কাছ থেকে উদ্ধার করেন। প্রস্তাবনাটি পড়লে একে সত্য না বলে উপায় নেই। কিন্তু কাহিনীটি লেখকের স্বকপোলকল্পিত।

এ প্রস্তাবনাতেই লেখকের এক সহপাঠী রউফনের কথা আছে, যার পিতামহ শাহ্ ফরিদ উদ্দীন জৌনপুরী এবং সে সূত্রেই পাণ্ডুলিপিটির সন্ধান লাভ। রউফন ছাত্র জীবনে প্রেমিকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গ্রামে ফিরে যায় এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা করে পড়ানোর কাজে ব্রতী হয় সংসারের একমাত্র অবলম্বন পিতামহের সান্নিধ্যে। প্রেমের মর্যাদা পায় নি বলে জীবন থেকে পালানোর কোন অভিপ্রায় তার ছিলো না– চুম্বকাকারে প্রস্তাবনায় এই ভাবটি মূর্ত। অনেক সমালোচক প্রচলিত বিচার পদ্ধতিতে মূল কাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্ক-সূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন :

> এই দুটি গল্পের মধ্যে স্থানের ঐক্য (Unity of Place) কালের ঐক্য (Unity of Time) বা আখ্যানভাগের ঐক্য (Unity of plot) ব্যাহত। নানাভাবে চেষ্টা করেও এ দুটি গল্পের মাঝখানে কোনও সূত্র আবিষ্কার সম্ভব নয়।[১১]

পরবর্তী সময় এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনিই শোনা গেছে অন্য গবেষকদের আলোচনায়। কিন্তু তাঁরা উভয়ের মধ্যে 'চেতনার ঐক্য' (Unity of Consciousness) অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন নি। প্রকৃতপক্ষে গল্প দুটোর মধ্যে স্থান-কালের বিস্তর পার্থক্য থাকলেও রউফনের অপরাজিত প্রেমসত্তা প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান সহ্য করেও দেশকে (গ্রামকে) ভালোবেসে যে সতত জাগরূক হয়ে রইলো, মূল কাহিনীর তাতারীর অপরাজিত মনোভাবের সঙ্গে এর সম্পর্ক আবিষ্কার এভাবেই সহজ :

> সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে এল রউফন। জীবনের কাছে পরাজয়না-মানা বীরেরই পৌত্রী। সে কিন্তু তার সজল চোখ আজ লুকাতে পারল না। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সেই সেরা ছাত্রটির কাছে প্রত্যাখ্যাত হোয়ে রউফন এমনি চোখেই আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। জীবনকে কিন্তু সে খোয়ার হোতে দেয় নি। বীরের পৌত্রী আপ্ত-মানবী।[১২]

উপন্যাসের মূল কাহিনীটি বাগদাদের, প্রস্তাবনা-গল্পের প্রেক্ষাপট বাংলার, চেতনার ঐক্যই উভয়কে এক সূত্রে বাঁধে। যেমন চেতনা নামক ওই অমিত বোধের সিঁড়ি বেয়ে মূল কাহিনীর প্রতীকাশ্রয়ে প্রতিবিম্বিত পূর্ব-পাকিস্তান ও সেখানকার দুঃশাসনকে আমরা দেখতে পাই।

৩.ক

'ক্রীতদাসের হাসি'র উপস্থাপন কৌশল ও ভাষাবয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার মূলেও এ বিষয়টি মুখ্য কাজ করেছে। এর সহজ সরল ভঙ্গিতে বাক্য গঠন, অলঙ্কার বিবর্জিত পেলব উপস্থাপনা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কাহিনীর কারণে বেশ কিছু আরবি-পারসি-উর্দু শব্দের সমাহার লক্ষযোগ্য হলেও তাতে গদ্য ভারাক্রান্ত হয় নি। আলাপচারিতার ঢঙে নাটকীয় ভঙ্গিতে সংলাপ-সৃজন উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে কাহিনীরস আহরণে পাঠকের যেমন কোন অসুবিধা হয় না, উপরন্তু নাট্যোপম উপস্থাপনার গুণে পুরো বিষয়টি একই সঙ্গে শ্রাব্য ও দৃশ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। বাইশটি পৃথক পরিচ্ছেদের সমন্বয়ে উপন্যাস; একাদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ দুটো বাদ দিলে আর প্রতিটিতেই রয়েছে নাটকের মতো সংলাপ। কোথাও বর্ণনা দিয়ে কাহিনী-সূত্রের বিবরণ প্রদান করা হলেও সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ব্যতীত আর কোথাও তা প্রধান হয়ে ওঠে নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে সমাসবিবর্জিত পরিচিত বাংলা শব্দের সঙ্গে অল্পপরিচিত বিদেশী শব্দ বা শব্দগুচ্ছের যে সাযুজ্য স্থাপিত হয়েছে তা অনন্য ভাষাশিল্পীর চমৎকার কারুকর্মের স্বাক্ষর বহন করে। উপন্যাসের স্বল্প বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে বা সৃষ্টি করেছে অপূর্ব চিত্রকল্পের :

> শুধু কি আকাশ? পৃথিবী নিজের অন্তহীন বিস্তার অস্বীকারের জন্য গণ্ডীর মধ্যে বিচিত্রার আতসবাজি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে এগোয়। থামতে চাইলেও থামাতে পারে না। তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষের মধ্যেই তাই পৃথিবী ভেঙে ভেঙে টুক্‌রো-টুক্‌রো ছড়িয়ে পড়ে; কিশোরীর দুর্বাবনে কুঁচফল হারিয়ে পুনরায় খোঁজার মত। খুঁজে পাওয়ার পর আবার ছড়ানো। ঝর্ণা উৎসারিত ছত্রাকার জলবিন্দুর উত্থান-পতনে এই লীলার আভাস কিছুটা চোখে পড়ে। তাই গরাদের উপরে শুধু আকাশই অস্তিত্বের ইশারা জাগায় না, ধেয়ে আসে চূর্ণিত পৃথিবী, টুকরো-টুকরো রঙীন কাঁচের মত অন্তহীন বর্ণ-সজ্জায়– পলানুপল, দণ্ড-প্রহর অহর্নিশ। (পৃ. ৯৫)

বর্ণনায় এই চিত্ররূপময়তা এবং পেলব ভাষার দ্যোতনা পাঠকের মনে যে বিশেষ ভাবের সঞ্চার করে তাতে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। বিদ্যাপতির কবিতায় রাধার আত্মোৎসারিত করুণ আকুতি : 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' শুধু কাব্যভাষা হিসেবে নয়, মধ্যযুগের কাব্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হিসেবে আদৃত। 'ক্রীতদাসের হাসি'তেও ঠিক ও ধরনের পঙ্‌ক্তি সৃষ্টি হয়েছে। কবি ইসহাক

মেহেরজানকে দেখে বলছেন : 'দেখলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না– দেহের প্রতীক ছন্দ, না ছন্দের প্রতীক দেহ।' (পৃ. ৩৯) পঙ্‌ক্তিটি বাচ্যার্থ অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশক হিসেবেই শুধু নয়, আশ্চর্যজনকভাবে অলঙ্কারে ভ্রান্তিমানতা নির্দেশ করছে। তাছাড়া এই উপন্যাসে 'ইডিপাসে'র অন্ধ টেরিসিয়াসের মতো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ পাঠকের চিন্তাশক্তিকে সচকিত করে। যেমন কবি নওয়াম হারুনকে বলছেন :

> [...] আমার ওই হুঁস আছে বলেই আমি বেহুঁস থাকতে চাই। আর যাদের সে হুঁস নেই অর্থাৎ যারা বেহুঁস তারা হুঁসে থাকে, অর্থাৎ – মোদ্দা কথা, যারা বেহুঁস তারা হুঁসে থাকে, আর যারা হুঁসে তারা বেহুঁস। [...] (পৃ. ৭২)

এ ধরনের বক্তব্য এবং বক্তব্য-প্রকাশক ভাষাভঙ্গি উপন্যাসটির পরম সম্পদ। 'আলেফ লায়লা'র সর্বশেষ অবিচ্ছেদ্য কাহিনী হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক উপন্যাসটিতে বাগদাদের পরিবেশ ও পাত্র-পাত্রীই নির্বাচন করেন নি, 'আরব্য রজনী'র মতো কাহিনী পরিবেশন করতে গিয়ে কোথাও এমন বর্ণনা দিয়েছেন[১৩] যেজন্যে গ্রন্থটির প্রথম সমালোচক থেকে সাম্প্রতিক এক ঔপন্যাসিক সমালোচকের কাছেও এতে 'যৌন খুঁজলানির চটক'[১৪] -এর সন্ধান মিলেছে। কিন্তু সাহিত্য শিল্পে শ্লীলতা-অশ্লীলতার সঙ্গে রুচিবোধের সম্পর্ক বিদ্যমান। সংস্কৃত সাহিত্য আদিরসাত্মক হওয়ার পরও সাহিত্যরসবেত্তাদের কাছে তা পরিত্যাজ্য নয়। কিংবা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কোথাও কোথাও আদিরসের প্রাবল্য লক্ষযোগ্য হলেও তার সাহিত্যিক মূল্যে এর প্রভাব পড়ে না। সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'প্রবন্ধ সংগ্রহে' মন্তব্য করেছেন যে, সুরুচির দিক থেকেই সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিবেচিত হতে পারে, সুনীতির দিক থেকে নয়। নীতিবাগিশগণ অবশ্য এতে স্বভাবতই হবেন ক্ষিপ্ত; কিন্তু এতে খুব বেশি হেরফের ঘটে না। 'ক্রীতদাসের হাসি'-ও এই 'সুরুচি'র বিচারেই বিবেচ্য, 'সুনীতি'র দিক থেকে নয়।

৩.খ

'ক্রীতদাসের হাসি'র অনেক চরিত্র ইতিহাসের সঙ্গে মিলে গেলেও উপন্যাসটি 'ঐতিহাসিক' নয় এবং সে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি আলোচিত হতে পারে না। কিন্তু তারপরও ঔপন্যাসিক-সমালোচক আবু রুশ্‌দ বাগদাদের বর্ণনায় তুষ্ট হন নি। বাদশা হারুনকে প্রজাবৎসল করে চরিত্রায়িত না করায় তিনি চরিত্রটির প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন।[১৫] আবু রুশ্‌দ নিজে ধর্মীয়

স্বাতন্ত্র্যবাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত।[১৬] তিনি হয়তো আশা করেছিলেন 'ক্রীতদাসের হাসি'তে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিচ্ছবি; যেখানে তাঁর অনুসৃত ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবধারা খুঁজে পাওয়া যাবে। সে কারণেই 'লালসালু' উপন্যাসে ধর্মীয় কুসংস্কারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটক অপরিহার্য প্রথম পরিচ্ছেদটি সম্পর্কেও তাঁর একই দৃষ্টিভঙ্গির মন্তব্য : '[লালসালু'র] প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা কাহিনীতে অবান্তর মনে হয়।'[১৭] বাদশা হারুন কতটুকু ধর্ম বা ইতিহাসসম্মত তার চেয়ে বেশি বিবেচ্য, চরিত্রটি উপন্যাসে কতটুকু সার্থক এবং কিভাবে। সাহিত্যরসপিপাসুগণ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে অবশ্যই মূল 'রামায়ণে'র সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন না। সে বিচারে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত হারুন অভাবনীয় পরাক্রমসম্পন্ন, দাম্ভিক, নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ এক স্বেচ্ছাচারী বাদশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

তাতারী ও মেহেরজানের মিলনরাতে মেহেরের রূপৈশ্বর্যে বাদশা হারুন চরমভাবে মোহাবিষ্ট হয়। মশরুরের কাছে কোরান ও নবির নামে মিথ্যে শপথ করে সে পরিচয় জেনে নেয় সুন্দরী মেহেরের। তারপরের রাতে একই দৃশ্য দেখে কবি ইসহাকের কাছে জানতে চায় বাদশা হারুন : 'ঝুটো চিজ কি খাওয়া যায়?' (পৃ. ৩৯) আসলে সে মেহেরজানকে দেখামাত্র কাম তাড়িত হয়ে পড়ে এবং তাই যখন মশরুর জানায় মেহের বেগম জুবায়দার প্রিয়পাত্রী তখন হারুনের কড়া নির্দেশ শোনা যায় : 'বেগম সাহেবা যেন এইসব রাত্রির খোঁজ না পান।' (পৃ. ৩৭) হাসির শব্দ শুনে প্রলুব্ধ বাদশা হারুন এর সূত্রসন্ধান করতে গিয়ে যখন সুন্দরী মেহেরকে আবিষ্কার করে তারপর থেকেও অভ্যন্তরীণ চরম কপটতা ও কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিতে দেখা যায় তাকে। এরপর মিলন-মুহূর্তে দাসবস্তিতে সশস্ত্র প্রবেশ করে তাতারীকে চরম দাম্ভিক একনায়কের মতো জিজ্ঞাসা করে : 'তুই শাদী করেছিস, অথচ খবর দিস্ নি? [...] [...] তোর কি জানা নেই আপন মাওলার (প্রভু) হুকুম ছাড়া কোন গোলাম শাদী করতে পারে না বা নিজের বেটির শাদী দিতে পারে না?' (পৃ. ৪৬) ঠিক এর পরেই নাটকের দক্ষ অভিনেতার মতো চরম মহানুভবতার সংলাপ উচ্চারণ করে বাদশা তাতারীকে ধনদৌলত ও বাগান দান করে স্বাধীন ঘোষণা করে; শর্ত একটি– বাদশার মন ভারাক্রান্ত থাকলে তাকে হাসি শোনাতে হবে।– কাহিনীর এ ধারাক্রম অবধি পাঠকগণ এমনকি বাদশার সঙ্গী কবি ইসহাক পর্যন্ত জানতে পারে না হারুনের মনোভিপ্রায় কি? কিন্তু পরবর্তী অর্থাৎ অষ্টম পরিচ্ছেদেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন হারুন কবি ইসহাকের আপত্তির মুখে জানায় আলেম আবদুল কুদ্দুস বাদশার অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করার জন্যে তাতারী ও মেহেরের বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করে সই দিয়েছে। নবম পরিচ্ছেদে সড়কের কাফিখানায় লোকমুখে আলোচনা চলে যে খলিফা হারুন

সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারেন। এরপর মেহের প্রসঙ্গ দীর্ঘ অনুপস্থিত থাকলেও উপন্যাসের শেষে প্রমাণ হয় সত্যি খলিফা হিসেবে শ্রদ্ধেয় হারুন বাঁদি মেহেরকে বিয়ে করেছে। এই বিয়ে গভীর গোপনীয়তা রক্ষা করে সম্পন্ন এবং মেহেরকে অজ্ঞাতস্থানে কড়া পাহারায় রাখা হয় বলে প্রমাণিত। কেননা, তাতারী মোহাফেজকে মেহেরের সংবাদ জানতে পাঠালেও সে খবর নিয়ে আর আসে নি। বেগম জুবায়দা বাঁদি তুতীকে মহলের অন্দরে সন্ধান করার জন্যে পাঠালে সে-ও ব্যর্থ হয় খোঁজ পেতে। আসলে বাদশা হারুন চরম বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে ইচ্ছে করলে তাতারীকে হত্যা করে মেহেরজানকে পেতে পারতো; অন্তত নিজের ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে যে হত্যা করতে পারে তার দ্বারা এটা অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু তা না করে শাস্ত্রীয় বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সে মেহেরকে লাভ করেছে এবং যথাসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করে। কেননা, পূর্ব-বিবাহিত স্ত্রী ও বন্ধু-পারিষদবর্গের দ্বারা একটি অন্তর্বিরোধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিলো তার।

তাতারীর মুখের হাসি পরবর্তী সময় হারুনের প্রধান কাম্য হয়ে উঠেছিলো। সাহিত্যিক বিবেচনায় দেখা যায়, সুচতুর বাদশা বুঝতে চেয়েছেন তাতারী মেহেরকে ভুলে গেছে কি-না। প্রচুর ধন-দৌলত, বাগান, দাস-দাসীর মালিক করে দিয়ে তাকে প্রলোভন দেখানো হয়েছিলো। মুক্ত ঘোষণা করা হলেও আসলে কিন্তু সে নজরবন্দি, শহরের বাইরে যেতে পারে না। বাগানরক্ষক মোহাফেজের কাছে হারুন যখন শুনলো তাতারী বিত্তে বিমুখ, ঐশ্বর্যে অনীহ, নর্তকীদের সঙ্গে সঙ্গ দেয় না, কোন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নেই তার আচরণে তখন সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে সে বাগদাদের শ্রেষ্ঠ নর্তকী বুসায়নাকে প্রেরণ করে তাতারীর কাছে। বিবসনা বুসায়নাও তাকে আনন্দিত করতে ব্যর্থ হয় এবং নিজে আত্মহত্যা করে। এর পরই খলিফা তার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়। প্রচণ্ড ক্রোধ ও হিংসায় তার তাৎক্ষণিক নির্দেশ : 'কিন্তু তার আগে মশরুর, সেই বান্দীর বাচ্চা, বান্দরের বাচ্চাকে কয়েদখানায় নিয়ে যেতে বলো। একদম হাবিয়া কয়েদখানায়। পোকামাকড় বিচ্ছুর সঙ্গেই জিন্দেগানী চলার উপযুক্ত ও একটা কমিনা-কমজাত।' (পৃ. ৯০) বুসায়না হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে চরম নির্যাতন করা হয় তাতারীকে কিন্তু রাজদণ্ডের ভয়েও তাতারী হারুনের কথায় রাজি না হলে আবার দক্ষ অভিনেতার মতো অভিনয় করে ধর্মের নামে শপথ করে : 'আজ তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-রূপে তোমাকে এইখানে ডেকে এনেছি। তুমি দেখছো, বাইরের বাতাসের কত দাম। আমি তোমার সমস্ত মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত। আমাকে ভুল বুঝো না।' (পৃ. ১০৬) এতেও ব্যর্থ হয়ে তিন দিনের সময় দেয়া হয়। তাতারী তিন দিন থেকে তিন বছর অতিক্রম করে কিন্তু, নিজের মতে থাকে অনড়। লক্ষ করার বিষয়,

সময় তিন দিন থেকে তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও 'হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু' হারুন কিন্তু তাতারীকে এ দীর্ঘ সময় কারাগারেই পুরে রাখে। প্রচুর ধন-দৌলত, বাগান, ক্রীতদাস-দাসী নর্তকী ইত্যাদি দিয়ে তাতারীকে মোহিত করে মেহেরজানকে ভুলানোই প্রথম দিকে বাদশা হারুনের লক্ষ্য ছিলো, যদিও সে বার বার 'হাসি' শুনতে চেয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে বিষয়টি বাদশার 'ইগো'তে পরিণত হয়। এই 'ইগো' ও 'তেজে'র লড়াইয়ে জয়ী হতেই হবে– এমন মানসিকতা থেকে জাত পরবর্তীকালে কৃত তার সব কর্ম। সেনাপতি, কবি-বন্ধু, পারিষদের সামনে এক অমিততেজী বাদশার 'সামান্য ইচ্ছা' একটি ক্রীতদাস কর্তৃক উপেক্ষাজনিত ক্রোধে শেষ পর্যন্ত তাতারীর 'হাসিটুকু'ই খলিফার একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড অহংবোধ সম্পন্ন হারুন অবশেষে তাতারীর প্রেমিকা ও স্ত্রী, বর্তমানে স্বীয় পত্নীরূপী মেহেরজানকে তাতারীর সামনে হাজির করতে বাধ্য হয়। নিজের 'আমিত্ব' ও 'বাদশাহিত্ব' প্রতিষ্ঠায় লড়াইয়ে জয়ী হবার জন্যে। উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে বাদশা হারুনার রশীদের প্রচণ্ড তেজোদ্দীপ্ত উচ্চারণ উপরোক্ত সত্য প্রতিষ্ঠা করে :

> মশ্‌রুর। তুমি বড় বাজে বকো। শুধু দেখো, দেখো। ওর তেজের সব পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি আজ। এই গোলাম– [কথায় ছেদ পড়ে। মেহেরজানের প্রবেশ। পরনে রেশমী লেবাস। যৌবন সর্বাঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থীর মত লুটাইয়া পড়িতেছে। চোখে মুখে হাসির ঝিলিক ছাপাইয়া ওঠে। আপ্ত-রমণীর মত চলাফেরা।] (পৃ. ১১৪)

মেহেরজানের উপস্থিতিতেও তাতারী হাসে না বরং বাদশাকে তাচ্ছিল্যের সম্বোধনে উচ্চারণ করে যে ধন-দৌলত দিয়ে বাঁদি, গোলাম কেনা গেলেও তার হাসি কেনা যায় না; অবশ্য এর আগে থেকে হারুনের নির্দেশে কোড়ার আঘাত চলতে থাকে। মৃত্যু হয় তাতারীর। নিজের ইচ্ছার অবজ্ঞা ও তেজের পরাজয়ের শোধ জীবন নিয়ে এভাবে গ্রহণ করে বাদশা হারুন।

'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী বাদশা হারুনার রশীদ চরিত্র বিশেষ মূল্যবান। নিজের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠায় অনড় এই অমিততেজী ব্যক্তিটি যেমন নির্মম, নিষ্ঠুর তেমনি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সেজে ছলনার অভিনয় করতেও পটু। বিচক্ষণ রাজনীতিক বাদশা হারুন গভীর রাতে মাত্র একজন সঙ্গীসহ বের হওয়া নিরাপদ মনে করে না, তার বিচারে : 'জয় বা পরাজয়ের গ্লানি মেটাতে পরাজিতদের গাল দেওয়া একটা রেওয়াজ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। [...] নীতি এখানে বড় কথা নয়। বল– লোকবল, অস্ত্র-বল, অর্থ-বল সব নীতির মাপকাঠি।' (পৃ. ১৮)

গগনচুম্বী দম্ভের অধিকারী বাদশা হারুনও ব্যক্তি মনে নিঃসঙ্গতা বোধ করেছিল। 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'[১৮]– এই একাকিত্ব আধুনিকতার একটি বড় লক্ষণ। আধুনিক সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে এই যুগযন্ত্রণা নতুন মাত্রা নিয়ে সমভূত হলেও যে কোন যুগের মানুষের মনে মাত্রা-ভিন্নতায় এর অবস্থান ছিলো নিশ্চিতরূপে। হারুনার রশীদ চরিত্রটির মধ্যেও আমরা এই নিঃসঙ্গতার সন্ধান পাই। উপন্যাসে তাঁর প্রথম বাক্য : 'এসো. এসো মশরুর। আজ আমি বড় একা। হ্যাঁ একা।' (পৃ. ১৩) প্রচণ্ড আত্মাভিমান, আধিপত্যবাদ ও আমিত্বের পথ ধরেই হারুনের মনে এই নিঃসঙ্গতার অনুপ্রবেশ। সহোদরা আব্বাসা ও মন্ত্রী জাফর বার্মেকীর প্রণয়কে মেনে নিতে বাধ্য হয়ে পরিণয়ে রাজি হলেও তাদের বাসর শয্যা হবে না এই ছিলো বাদশার নির্দেশ। কিন্তু বিয়ের পর বোন নিজেই বাসর শয্যার আয়োজন করলে তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে খলিফার হুকুমে জাফরকেও হত্যা করা হয়। এই হত্যা একান্তই হারুনের ব্যক্তি-ইচ্ছাকে অমর্যাদা করার ফলে সংঘটিত। কিন্তু সহোদরা ও তার পতিকে হত্যার পর বাদশার অবস্থা : 'হারেমের এই কামরা আমার কাছে দোজখ। স্মৃতির হাবিয়া নরক আমার খুন শুকিয়ে দিয়েছে। গুম-খুন আমার ঘুম।' (পৃ. ১৬) কোন ভাবেই এ থেকে মুক্তি পায় না সে। বিরাট রাজ্য, প্রাসাদের ঐশ্বর্য, পত্নী-উপপত্নী, বন্ধু-পারিষদ, ক্রীতদাস, বাঁদি কোন কিছুতেই তার মনের নিঃসঙ্গতা দূর হয় না। সেনাপতি মশরুর যখন প্রস্তাব দেয় একশ আর্মেনীয় সুন্দরী নর্তকী মনোরঞ্জনের জন্যে তার হুকুমের অপেক্ষায়– হারুন সব ফিরিয়ে দেয় এই বলে : 'কিন্তু স্মৃতি, মশরুর? স্মৃতি লাশ জেন্দা করে তোলে।' (পৃ. ১৪) লেডি ম্যাকবেথও এ ধরনের স্মৃতি-তাড়িত হয়েছিলো। উচ্চাশা ফলবতী করতে গিয়ে একাধিক গুপ্ত হত্যার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে। ডানকান খুন হওয়ার পর লেডি ম্যাকবেথের মনের যে অবস্থা, বোন ও তার স্বামীকে হত্যার পর বাদশা হারুনের মনোবস্থাও তদ্রূপ। এহেন মনে সামান্য শান্তির পবনদোলার প্রত্যাশায় রাতে মশরুরের সঙ্গে প্রাসাদের বাগানে পায়চারী করার সময় সে তাতারী ও মেহেরজানের মিলনহাসি শুনে প্রলুব্ধ হয়। এই পর্যন্ত বাদশা হারুন চরিত্রের মনোজাগতিক আবেগ-অনুভূতির স্বাভাবিক দ্বন্দ্বজাত যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে চরিত্রটির মধ্যে আরও বড় সম্ভাবনার বীজ উপ্ত ছিলো বলে মনে হয়। 'নির্জনতাই আমার পছন্দ। এখানে রাত্রির হাওয়া পাঁজরের দাহ নিভিয়ে দিতে পারে। কবির জায়গা আর কোথাও। ওরা বুকের কল্লোল আরো বাড়িয়ে তোলে।' (পৃ. ১৭)– এই অনুভূতি যার অন্তরে, পরবর্তী পরিচ্ছেদ থেকে সে কিভাবে একটি 'লক্ষ্য'কে কেন্দ্র করে উত্থিত হয়, মেহেরজানের দেহ ও তাতারীর 'হাসি' শুধুমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে তার মনে, প্রশ্ন

জাগে। অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্য প্রতীকাশ্রয়ে সমকালের চিত্র উত্থাপন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিক থেকে বাদশা হারুন নিশ্চয়ই সফল প্রতীক চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পেরেছে।

৩.গ

তাতারী হাবসী ক্রীতদাস কিন্তু হৃদয়সম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ববান্ স্বশিক্ষিত পুরুষ। প্রেমিকা মেহেরজানের সঙ্গে নিভৃতকুঞ্জে নির্দোষ কৌতুকাবহ কথোপকথনে যেমন তার সরলতা প্রকাশ পায়, তেমনি বাদশা হারুন কর্তৃক প্রদত্ত ধন-দৌলত-বাগান সে যে মনে গ্রহণ করে তাতে কোন সন্দেহ প্রবণতা বা ভাবীকূটকল্পনা কাজ করে না তার মনে। বাদশার ঘোষণায় নিজেকে সত্যি মুক্ত বলে ভাবে তাতারী। কিন্তু যখন বুঝতে পারে মেহেরজানকে বাদশা ছলনা করে 'লুণ্ঠন' করেছে, তাকে কার্যত করা হয়েছে নজরবন্দি, তখন তার মধ্যে আত্মসত্তার উন্মেষ ঘটতে থাকে। এই উন্মেষ ঘটে খুবই দ্রুতগতিতে এবং একান্তই তাতারীর মনোজগতে। অন্য কোন ক্রীতদাস বা বাগান রক্ষককে সে বাদশার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে না। দুই পক্ষের সম্মুখ সমরে জয়-পরাজয় নির্ধারণ এই সরল সমীকরণে ঔপন্যাসিক আস্থা রাখেন নি বলেই একটি বিশেষ চেতনার প্রতীক হওয়ার পরও তাতারীকে শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে দাঁড় করাতে নানা সংঘাত দ্বন্দ্বে তিনি এনেছেন চেতনার ধারাবাহিক উত্তরণ।

ধন-দৌলত-বাগানের মালিক হবার পরও বাগানরক্ষক মোহাফেজকে সব মানুষ সমান বলে তাতারী মর্যাদা দিয়েছে। তার কাছে অর্জন করে ভোগ করাই বড় কথা, কারো দান বা অযোগ্যতায় পুরস্কার প্রাপ্তিতে আনন্দিত হওয়া উচিৎ নয়। এসব কথায় চরিত্রটির স্বশিক্ষার প্রতিফলন পাওয়া যায়। তাই বাগান রক্ষকেরও মনে হয়েছে, 'আপনি উজির মরহুম জাফর বারমেকীর মত আক্কেলমন্দ্ কথা বলেন।' (পৃ. ৫৯) প্রেমিকা ও প্রেম তার কাছে কতো পবিত্র এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন খলিফা কর্তৃক প্রেরিত সুন্দরী নর্তকী বুসায়নাকে সে ফিরিয়ে দেয় প্রেম ও মাতৃত্বের শাশ্বত বাণী উচ্চারণ করে (দ্রষ্টব্য : পৃ. ৭৫-৭৬)। বুসায়নার আত্মহত্যায় তাতারী যেভাবে কাতর হয় তাতে চরিত্রটির মধ্যে মনুষ্যত্বের চরম স্ফুরণ লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে।

বাদশা হরুন ও তার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তাতারীর ব্যক্তিমনে এতোই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিলো যে কোনভাবেই তার চেতনা পরাভব স্বীকার করে নি। তাতারীর ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও স্ফুরণ একক নীরব প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বাদশা তাতারীর 'হাসি' শুনতে চায়। তাতারী বাদশা কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার পর আর

কখনও হাসে নি। তবে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সে বিষণ্নভাবে কথা বলেছে, তারপর থেকে কথা বলাও বন্ধ করেছে। এই ক্রম বাড়ন্ত প্রতিবাদের মুখে হারুনের অত্যাচারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শারীরিকভাবে নির্যাতিত আত্মজাগরণে বলীয়ান তাতারী শেষ পর্যন্ত বাগদাদের খলিফা হারুনকে প্রথাসিদ্ধভাবে সম্বোধন না করে অবজ্ঞাভরে নাম ধরে বলে ওঠে :

> শোন, হারুনার রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব–! কিন্তু– কিন্তু– ক্রীতদাসের হাসি-না না-না-না- (পৃ. ১২১)

দীর্ঘক্ষণ নির্বাক থাকার পর তাতারীর এই একটিমাত্র অন্তিম সংলাপ উচ্চারণ তার সারা জীবনের ক্ষোভ প্রকাশক ও লালিত চেতনার স্পর্ধিত ঘোষক– যা 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'। লালিত চেতনা ও ব্যক্তিত্বের মর্যাদাদানে পূর্বাপর একনিষ্ঠ তাতারী একটি প্রতীক চরিত্র হয়েও স্বমহিমায় ভাস্বর।

৩.ঘ

কবি ইসহাক, নওয়াস, আতাহিয়া এমন একটি জীবনসত্যের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত যা চিরন্তনতার বাণীবহ। নওয়াস-আতাহিয়ার আবির্ভাবের পর কবি ইসহাক উপন্যাসে নেই। কবি ইসহাক ও নওয়াস একই চেতনার পূর্বের ও পরের নাম। ফলে চরিত্র দুটোকে একই সঙ্গে আলোচনা করা চলে।

উভয়েই বাদশার বন্ধু। রাতে মেহেরজানকে দেখার পর ইসহাক এতোই মুগ্ধ হয়েছিলো যে, দেহ ও ছন্দের উপমান-উপমিতের বিভ্রম দেখা দেয় তার মনে। 'ঝুটো চিজ' খাওয়া সম্পর্কে বাদশাকে সে যে পরামর্শ দিয়েছে তা কোন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে নয়। 'জীবন যৌবন বহতা নদীর মত। কত তৃষ্ণার্ত আকণ্ঠ পান করে যাবে, তবু ঝুটা হবে না।' (পৃ. ৪০)– এ বক্তব্য তার জীবনদর্শনের প্রতিবিম্ব, অফুরন্ত জীবন-যৌবনের জয়গান এর নেপথ্যে। অন্যের বিবাহিত স্ত্রীকে সম্ভোগ করার পক্ষপাতী সে নয়। তাই হারুনকে সে বলেছে, 'তা ত উচিত নয়। মেহেরজান বিবাহিত স্ত্রী। আর কারো জন্যে সে হারাম।' (পৃ. ৫৪) কোন কোন সমালোচক তাকে পাকিস্তানী শাসকতন্ত্রের অনুগত বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি [১৯] হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে বাদশার সঙ্গে ইসহাকের কথোপকথনচ্ছলে যে বচসা হয় তাতে উপরিউক্ত বক্তব্যের বিপরীত সত্য প্রকাশ পায়। হাসির উৎস সম্পর্কে ইসহাক : 'হেকিমী দাওয়াই তৈরি করতে অনেক রকম উপাদান প্রয়োজন হয়। তেমনি হাসির জন্য বহু অনুপান দরকার। [...] [...]

ধরুন, সব আছে– নিরাপত্তা নেই। হাসি তৈরি হবে না'। (পৃ. ৫৪) অথবা আলেম মেহেরজান ও তাতারীর বিয়েকে অসিদ্ধ ঘোষণা করেছে একথা বাদশার মুখে শুনে তার স্পর্ধিত উচ্চারণ : 'আবদুল কুদ্দুস আল্লার কালাম বিক্রী করেছেন।' (পৃ. ৫৫) এর পর কবি নওয়াসও একই কথা বলেছে হারুনকে : 'হাসির জন্য ওয়াক্ত লাগে, [...] [...] উপাদান লাগে।' (পৃ. ৭১) কবি নওয়াস নিজে ভোগানুরাগী কবি কিন্তু জীবন সম্পর্কে তার বক্তব্য অন্যদের থেকে পৃথক। নারী ও সুরাসক্ত নওয়াসের স্বগত উচ্চারণ : 'জীবনের দিকে দিকে হে অমৃতের পুত্র, অগ্রসর হও। মৃত্তিকা থেকে আকাশে পাড়ি দাও– কিন্তু তোমার দুই পা সব সময় যেন মাটির উপর থাকে এইভাবে আকাশও তোমার কাছে ধরা দিয়ে যাবে।' (পৃ. ৯২) ভোগানুরক্ততা তার চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হলেও জীবন সম্পর্কে তার এই মৃত্তিকামুখী ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মরুভূমি যতো বড়োই হোক না কেন তার ঊষরতা কাম্য নয়, বরং বহতা নদী দজ্‌লাই তার জীবনের প্রতীক : 'নওয়াস ভাবলে , 'দজ্‌লা ত নদী নয়– আমার বুক। সম্মুখে কোথাও অন্ধকার আছে বলে কী এই নদীর স্রোতদল শহরের আলোস্নাত এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায়? অন্ধকারের রহস্য কী তাদের টানে না?... আমি নিজেই এক দজ্‌লা।' (পৃ. ৯৪) জীবন সম্পর্কে ইতিবাদী অথচ অন্যায়ের প্রতিবাদী এই কবিপ্রাণ নওয়াসকে নিয়ে সরাইখানাগুলোতেও আলোচনা হয় যে, ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের কাছে সে আপোসহীন মানুষের প্রতীক হিসেবে শ্রদ্ধা পাবে। কেননা তার কাছে বাগদাদবাসীর হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখই প্রধান, অন্য কিছু নয়। দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের মূর্ত প্রতীক কবি নওয়াসের বক্তব্য : 'মৃত্যুর পর ফেরেশ্‌তা যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি বাগদাদে না বেহেশতে যেতে চাও? আমি জবাব দেব, বাগদাদে।' (পৃ. ১০৫)

বাদশা হারুনের স্বেচ্ছাচারী প্রতিটি কর্মের প্রতিবাদ করেছে কবি নওয়াস। তাতারীকে অমানুষিক নির্যাতনের বিরোধী সে, ইসহাকের মতো তারও একই বক্তব্য হাসির উৎস সম্পর্কে। উপন্যাসের সর্বশেষ সংলাপ তারই কণ্ঠ-নিসৃত : 'আমিরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।' (পৃ. ১২১)– যা ক্রীতদাসের হাসির মূল বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শিল্পীরা (এখানে কবি) সত্যের পূজারী, সত্যভাষী এমন কি সত্যের প্রতীক। যা সত্য তা যদি কোন গোষ্ঠীস্বার্থকে আঘাতও করে তবুও তাঁরা সত্য প্রকাশে কুণ্ঠিত হন না। আইয়ুবি সামরিক শাসনামলের যে ত্রাসসৃষ্টিকারী সময়ে উপন্যাসটি রচিত তাতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কবি নওয়াসের প্রতিবিম্বে লেখক শওকত ওসমানই যেন উচ্চারণ করলেন সেই স্পর্ধিত বক্তব্য।

৩.৬

উপন্যাসের নারী চরিত্রের মধ্যে বেগম জুবায়দা ও বাঁদি মেহেরজানের চরিত্রই উল্লেখযোগ্য, যদিও উভয় চরিত্রই খুব 'স্কেচি'। বাদশার 'সহধর্মিণী' হিসেবে পরিচয় দেয়া হলেও বিরাট রাজপ্রাসাদে প্রায়শই নিঃসঙ্গ একাকী থাকতে হয় জুবায়দাকে। বাগদাদের অধিশ্বরী হলেও মনের অকথ, যন্ত্রণায় সে প্রতিনিয়ত একাধিক পত্নী, উপপত্নী ও বাঁদির কক্ষ থেকে কখন বাদশা এসে দেখা দেবে তার খাসমহলে এই প্রতীক্ষাতে দিনাতিপাতকারী বেগমের ঈর্ষামিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস বর্ষিত হয় এভাবে : '[মেহেরজানকে] যা। এই সুম্‌শান রাত। এখন জওয়ানের বুকের মধ্যে বাঁধা পড়তে কি যে সুখ–'। (পৃ. ৯) বাঁদি মেহেরকে সে বিয়ে দিয়েছে সুন্দর সুঠাম দেহী এক হাবসী ক্রীতদাসের সঙ্গে। শুধু বিয়ে দিয়েই নয়, প্রতিরাতে মিলনের ব্যবস্থা, মিলনপূর্বে মেহেরকে সুর্মা দিয়ে সাজিয়ে পাঠানো ইত্যাদির মধ্যে নিজের বঞ্চিত সুখ লাভ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বেগম। বিলম্বে যে 'একজনের বুক খা খা করছে' একথা নিজেকে দিয়েই বুঝে জুবায়দা, তাই মেহেরকে পাঠিয়ে দেয় জলদি।

সম্রাজ্ঞী কিন্তু রমণী-সুখ বঞ্চিত এক নারী জুবায়দা তার বাঁদি মেহেরজানের আনন্দে নিজেকে উজ্জীবিত রাখতে চায়। বহু মানুষের বিরাট মহলের অধিশ্বরী নিজেকে সেখানে একা আবিষ্কার করে বলেই মেহের নিরুদ্দেশ হলে বাঁদি তুতীকে দিয়ে খবর নেয়ার চেষ্টা করে। এতে ঔপন্যাসিক আবু রুশ্‌দ 'লিবিডো' ভাবের ব্যর্থ অনুসন্ধান করেছেন।[২০] উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যে, মেহের বেগমের পাঁজরের হারের মতোই অবিচ্ছেদ্য ছিলো। মেহেরের দৈহিক অনুপস্থিতি বেগমকে নিঃসঙ্গ করে দিলেও মেহের শুকতারা হয়ে চির জাগরূক তার প্রাণের অসীমতায়। বিত্ত-বৈভব-মর্যাদার খোলসে নিজের রমণীত্বের কামনা-বাসনাকে কিভাবে অবদমিত রাখতে হয়েছে বেগম জুবায়দা তারই প্রতিচ্ছবি।

মেহেরজান তাতারীর প্রেমে একসময় উচ্ছল ছিলো। কিন্তু বাদশা হারুন কর্তৃক 'লুণ্ঠিত' হয়ে বেগম হবার পর দীর্ঘ বিচ্ছেদজনিত কারণে সে তাতারীর প্রেমকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বিস্মৃত হয় এবং তাই তার বেশ নির্লিপ্ত উক্তি : 'স্বপ্নভাঙার পর স্বপ্নে-দেখা ধন-দৌলত হারানোর শোকে কেউ কোনদিন কাঁদে নাকি– এক নির্বোধ ছাড়া।' (পৃ. ১১৯) তাতারীর প্রেমে অবিচলতা সম্পর্কিত পূর্বোক্তি স্মরণ করে পরে মেহের নিজেও আবেগে বিচলিত হয় পড়েছে। উপন্যাসের শুরুতে মেহেরজানকে দেখা গেলেও তাকে আবার পাওয়া যায়

সর্বশেষ পরিচ্ছেদের অন্তিম মুহূর্তে, অল্প কয়েকটি সংলাপ উচ্চারণকালে। এতে প্রেম রক্ষায় নিজের অসহায়ত্ব যেমন বর্ণিত, তেমনি তাতারীর প্রতি 'কোড়াঘাতের এত ব্যথা বয়েছ, এস মুছিয়ে দিই, মুছিয়ে নিই–' (পৃ. ১২০) বক্তব্যের মধ্যে প্রণয়ীকে আপন করে নেবার প্রেমজ স্বাভাবিক আকুলতা প্রকাশিত। এই অভিব্যক্তি ও অনুরাগ মেহেরজানের নারী সত্তাকে মহান করে তুলেছে। প্রেমের জন্যে তাতারী যে ত্যাগ স্বীকার করেছে মেহেরজান তা করে নি– বলতে হয়, তার পক্ষে সে রকম ত্যাগ স্বীকার অসম্ভব ছিলো। আসলে বাদশাহী বিত্ত ও জৌলুসে আরমানী মেহেরজান যে তার পূর্ব প্রণয়ী ও স্বামী এক ক্রীতদাসকে ভুলে যায় নি বরং নিজের পরিণামের কথা না ভেবে তাতারীর করুণ অবস্থায় স্পর্শ করে কাছে যেতে চেয়েছে– এখানেই হয়েছে শাশ্বত নারী হৃদয়ের বিদ্রোহ এবং জয় ঘোষিত।

৪.

শুধু বক্তব্য-নির্ভর প্রতীকধর্মিতায় শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'র মূল্যায়ন নয়, ভাষা, অলঙ্কারব্যবহার, উপস্থাপন কৌশল ও চরিত্র-সৃজন প্রণালীতে ঔপন্যাসিক যে বিস্ময়কর সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তাতে শিল্পোত্তীর্ণ উপন্যাস হিসেবে 'ক্রীতদাসের হাসি' আদৃত হবার যোগ্য। সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ শওকত ওসমান যে সাহিত্যিক দায়মুক্ত নন আলোচ্য উপন্যাসটি তার বড় প্রমাণ। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি থেকে উপন্যাসটির প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ[২১] একারণেই পাঠক-নন্দিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সালাম সালেহউদ্দীন, সাপ্তাহিক 'খবরের কাগজ', ১২ই জানুয়ারি ১৯৯৩, ঢাকা।

২। শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাংলা সাহিত্যের নানারূপ, বিশ্বাস বুক স্টল, ১৩৯১, কলকাতা; পৃ. ১৩৯

৩। জাহাঙ্গীর তারেক, প্রতীকবাদী সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, ঢাকা; পৃ. ১-২

৪। 'ক্রীতদাসের হাসি' প্রকাশক আবদুল বারি কর্তৃক এ. বি. পাবলিকেশন্স ১৪ জিন্নাহ্ এভিনিউ, ঢাকা থেকে জুলাই ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল্য ছিলো ৪.৫০ টাকা। আশ্বিন ১৩৬৯ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯২) ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা 'সমকালে' ইসমাইল মোহাম্মদ কর্তৃক লিখিত সমালোচনা প্রকাশ পায়।

৫। মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, ক্রীতদাসের হাসি, প্রসঙ্গ বিচিত্রা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬, ঢাকা; পৃ. ৭৪

৬। আমিনুল ইসলাম, সময় ও সাহিত্য, নলেজ হোম, ১৩৭৪, ঢাকা; পৃ. ৫৬-৫৭

৭। ইসমাইল মোহাম্মদ, ক্রীতদাসের হাসি (পুস্তক সমালোচনা), সমকাল, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৯, ঢাকা।

৮। রবীন্দ্র গুপ্ত, উপন্যাসের পূর্ব-সূচনা. ঐকতান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ১৯৯০-৯১, কলিকাতা; পৃ. ৭

৯। আবু রুশ্‌দ, শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস, সৃজন প্রকাশনী লিঃ জুলাই ১৯৮৮, ঢাকা; পৃ. ২৬

১০। ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা; পৃ. ৬৩১

১১। আবদুল হাফিজ, গ্রন্থ প্রসঙ্গ, পূর্বমেঘ. চৈত্র ১৩৬৯, রাজশাহী।

১২। শওকত ওসমান, ক্রীতদাসের হাসি, মুক্তধারা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩. ঢাকা, পৃ. ৪। এরপর এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পাশে শুধু পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করা হবে।

১৩। ক্রীতদাসের হাসি, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১, ৩০-৩৩, ৬৫, ৭৫

১৪। আবু রুশ্‌দ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪

১৫। দ্রষ্টব্য : আবু রুশ্‌দ, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯ ও ৩২

১৬। মুহম্মদ ইদরিস আলী, আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল, বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৮৮, ঢাকা; পৃ. ১১৬

১৭। আবু রুশ্‌দ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৬

১৮। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ (প্রতীক্ষা), দেজ পাবলিশিং, ১৯৮৪, কলিকাতা; পৃ. ৩৩৪

১৯। পল্লব সেনগুপ্ত, বাংলাদেশের উপন্যাসে অতীতচারণার রূপকে সমকাল, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৯৪, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

২০। আবু রুশ্‌দ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩১

২১। Shoukat Osman, A Slave Laughs, Translated by Kabir Chowdhury, 1976, Hind Pocket Books (P) Ltd. G.T. Road, Delhi-110032